শুভ নববর্ষ ১৪২৯

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক ॥"

এসকেএস ফাউণ্ডেশন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১লা বৈশাখ ১৪২৯

বাংলা নববর্ষ ও বাঙ্গালিয়ানা

ড. অনামিকা সাহা

আপন বেগে বহিছে নদী মোহনায় হারিয়ে যাবার নেশায়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনও হারিয়ে যায় রাতের স্নিগ্ধতায়। অস্তমিত হয় শেষ বিকেলের সূর্য। সময় এমনি হয়। সেই সময়ের পথ ধরে পুরনো হয়ে গেলো জীবনের আরো একটি বছর। কবির ভাষায়- বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক---/যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,/অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক--।। বাঙালি জাতির জীবনে অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন প্রধান একটি উৎসব পহেলা বৈশাখ। প্রতিটি বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে উৎসবের আমেজ। আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। জীর্ণ-শীর্ণ পুরাতনকে পেছনে ফেলে নতুনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যাওয়া, বাঙালির চিরায়ত উৎসবে মেতে ওঠা।

নববর্ষ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যময় উৎসব। কেননা পৃথিবীতে প্রচলিত অধিকাংশ বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণের সময় (৯৬৩ হিজরি) 'ফসলি সন' নামে যে সন প্রবর্তন করেন, তা কালক্রমে 'বাংলা সন' নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন হিজরি সনের ভিত্তিতে এ দেশে বছর গণনা হতো। হিজরি বছর চন্দ্রের হিসাবে গণনা হয় বিধায় সৌর বছর থেকে ১১ দিন ছোট ফলে কৃষির হিসাব-নিকাশ এলোমেলো হয়ে যেত। এতে কৃষকদের 'ফসলি সন' গণনায় সমস্যা তৈরি হয়। ফলে কৃষকের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায় করতেও সমস্যা দেখা দেয়। জমিদার ও কৃষকদের সুবিধার্থে, এ সমস্যা দূর করতে মূলত বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই বাংলা নববর্ষের উৎসবের আমেজটা কৃষকের একটু বেশিই থাকে।

শুরুতে পহেলা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতা কৃষক, জমিদার ও ভূ-স্বামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এ উপলক্ষ্যে মেলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হতো। ধীরে ধীরে তা ব্যাপকতা পায়, নানা উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ হয়ে ওঠে সর্বজনীন শুভবোধ আর কল্যাণ চেতনার প্রতীক। সত্যিকার অর্থে বাংলা নববর্ষ একমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ উৎসব। প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি উপাদান হিসেবে বাংলা নববর্ষ পালিত হলেও পরে রাজনৈতিক আন্দোলন দিনটিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র সংগীত ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর আক্রমণ শুরু হলে ছায়ানট পহেলা বৈশাখ রমনার বটমূলে রবীন্দ্র সংগীতের আয়োজন করে। আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে এ ছিল প্রতিবাদ। সেই থেকে বাঙালির আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের যাত্রা শুরু।

বাংলা 'নববর্ষ'কে কেন্দ্র করে গ্রামগঞ্জে বৈশাখী মেলা বসে। কৃষিজ পণ্য, কুঠির শিল্প দ্রব্য, মৃৎ ও হস্তশিল্প দ্রব্য, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, খেলনা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ধুম পড়ে মেলায়। আগের দিনে মেলায় প্রদর্শনী হতো বাঁশের-বেতের তৈজসপত্র, নানা জাতের খেলনা সামগ্রী, নারিকেল মুড়কিসহ কত কি থাকে মেলায় তার ইয়ত্তা নেই। মেলার সময় নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তির আসর, এমন কি মেলায় ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, বলী খেলা, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি বিনোদন অনুষ্ঠান বসতো। তখন মেলা ছিল বাঙালির প্রাণের উৎসব। মেলা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা হতো। আর বিবাহিতা মেয়েরা নাইয়র আসতো বাপের বাড়ি। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই বৈশাখী মেলায় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। এছাড়া চৈত্র সংক্রান্তি, চড়কপূজা, আমানি, হালখাতা, গাজনের গান ইত্যাদি গ্রামীণ অনুষ্ঠান যা আগের দিনে মাস জুড়ে চলতো। এ উৎসবগুলো সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে বাঙালির ঘরে ঘরে। এখনো 'নববর্ষে' হালখাতার হিড়িক পড়ে প্রত্যেক গ্রামগঞ্জে। দোকানীরা সারা বছরের বাকীর খাতা সমাপ্ত করার জন্য পহেলা বৈশাখের দিনে নতুন সাজে বসেন দোকানে। গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন নতুন বছরের ব্যবসার সূচনা। নববর্ষের দিন সামাজিকভাবে বড়দের প্রণাম করার এবং মিষ্টি-নাড়ু উপহার পাওয়ার রেওয়াজ ছিল আমার নিজ গ্রামে। ছোট বয়সে আমরা অধীর আগ্রহে এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করতাম এবং অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখতাম কার বাড়ি থেকে শুরু করব। এক সঙ্গে এত মিষ্টি খেতে পারব না বলে আমরা সঙ্গে করে থলে নিয়ে যেতাম। এমনিভাবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাংলার গ্রামে গ্রামে আনন্দের ধুম পড়ে যেতো। সামাজিক ও লোক উৎসবের এই দিনটি বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক দিবসে রূপ নিয়েছে।

বাঙালি সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এক সর্বজনীন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। নতুন প্রজন্মকে হতে হবে শেকড়সন্ধানী। উচ্চকিত করতে হবে মানবিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঙালি সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের দর্পণ। এটা নিরন্তর চর্চার বিষয়। মুখে এক আর কাজে অন্য- এভাবে আর যাই হোক বাঙালি সংস্কৃতি চর্চাকে বেশি দূর এগিয়ে নেয়া যাবে না। সংস্কৃতি মানে কেবল নাচ, গান, সিনেমা-নাটক নয়। মনুষ্যত্ব তথা মানবধর্মের সাধনাই হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা যা ভাবী, পছন্দ করি এবং যা প্রতিদিনের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয় তা-ই আমাদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে নিজস্বতা নিয়ে সুন্দরভাবে বিচিত্রভাবে বেঁচে থাকা। তরুণ-যুব ও শিক্ষার্থীদের মনে জাতীয় মূল্যবোধ সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। আঁকড়িয়ে ধরতে হবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে। উন্নত জীবন গড়ার পাশাপাশি অতীত স্মৃতিকে মনে জাগ্রত রাখতে পারলেই প্রকৃত বাঙালির পরিচয়ের মৃত্যু ঘটবে না। তাঁহলেই আমাদের বাঙালির 'নববর্ষ' উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

কবি নজরুল গেয়েছেন- 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়। তোরা সব জয়ধ্বনি কর'। নতুন বছরে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক, দেশ ও জাতির মঙ্গলে জনগণের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত দেশপ্রেম জাগ্রত হোক, খুলে যাক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার, বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। বাংলা নববর্ষে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

[উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা।]

পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা

পলাশ কুণ্ডু

পহেলা বৈশাখ। বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ-এর ১ তারিখ। বঙ্গাব্দের প্রথম দিন তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ এমনকি দেশের সীমারেখা ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে সকল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের উপলক্ষ্য। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং বিশ্বের নানা দেশে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উৎসবের সাথে উদযাপন করেন। আমাদের দেশে এই উৎসবটি শোভাযাত্রা, ব্যবসায়ীদের হালখাতা খোলা, বাড়িতে পান্তা-ইলিশ খাওয়া, লাল হলুদ রঙিন পোষাক পরে উদযাপিত হয়।

কয়েকজন ঐতিহাসিক বাংলা দিনপঞ্জি উদ্ভবের কৃতিত্ব দেন ৭ম শতকের রাজা শশাঙ্ককে। পরবর্তীতে বিখ্যাত মুঘল সম্রাট আকবর এটিকে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায়ে কৃষকের সুবিধার কথা বিবেচনায় কৃষিপণ্য পরিণত হওয়ার সময়ের সাথে মিল রেখে মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার করার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর সন এবং হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম প্রচলন করেন। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে। আকবরের সময় থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রজারা বাংলা চৈত্র মাসের মধ্যে খাজনা প্রদান করতে বাধ্য ছিলেন। এর পরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের দিন জমির মালিকেরা নিজেদের এলাকায় অধিবাসীদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হতো, ধীরে ধীরে তা একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে। তখনকার দিনে এই দিনের একটি প্রধান ঘটনা ছিল হালখাতা তৈরি করা। হালখাতা বলতে নতুন হিসাব বই বোঝানো হয় বিশেষ করে ব্যবসার হিসাব রাখার জন্য।

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ সকল মানুষের সর্ববৃহৎ জাতীয় উৎসব। আর এই উৎসবের মূল আকর্ষণ সারাদেশে সকল বয়সের নাগরিক অংশগ্রহণে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে রঙিণ শোভাযাত্রা সহকারে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ বা চত্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। তবে খুব সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনে এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...গানের সাথে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্তরসহ বিশাল এলাকায় সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলে আনন্দ উচ্ছ্বাসে শুভ নববর্ষ বলে একে অপরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। কোলাহলে মূখরিত হয়ে ওঠে এই বর্ণিল উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে টিএসসি বা রমনা এলাকায় বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পণ্য প্রচারের কৌশল বা বিজ্ঞাপণ বা উপহার মানুষের নজর কাড়ে। সাথে অনেক ছোট বড় অস্থায়ী উপহার বা পান্তা-ইলিশ বা ঐতিহ্যবাহী খাবারের দোকান মেলার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বিগত বছরগুলোতে পহেলা বৈশাখের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের আয়োজনে রঙ-বেরঙের মুখোশ, প্রাণীদের অবয়ব, পুতুল, প্রতীকি ছবি, ব্যানার বা ফেস্টুনসহকারে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে বাংলা নববর্ষের মূল আকর্ষণ। এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ উৎসবমূখর পরিবেশে নেচে-গেয়ে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গ্রাম-বাংলার চিরচেনা রূপে মানুষ যেন তার শেকড়ে ফিরে যায়। ১৯৮৯ সালে প্রথম যেবার চারুকলা থেকে এই শোভাযাত্রা বেড়িয়েছিল তখন এর নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা। পরের বছর ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুল হক এবং ভাষাসৈনিক এমদাদ হোসেনের প্রস্তাবে এর নাম মঙ্গল শোভাযাত্রা করা হয়। প্রথম শোভাযাত্রায় ১টি হাতি, ১০টি ঘোড়া, ৫০টি মুখোশ এবং অসংখ্য মুকুট বানানো হয়। তবে এরও আগে ১৯৮৫ সালে যশোরে এই বর্ষবরণ শোভাযাত্রার সূত্রপাত। যশোরের চারুপীঠ আর্ট ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সেই বছর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে, ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই উৎসব শোভাযাত্রাকে "মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" হিসাবে ঘোষনা করে। বাঙ্গালির এই সর্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখের দিন শোভাযাত্রার আয়োজন বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলা, উপজেলায় পালিত হচ্ছে। আমাদের এই সম্মিলিত শোভাযাত্রাই হয়ে উঠুক বিশ্বজুড়ে সকল বাঙালির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মঙ্গল যাত্রা।

[উন্নয়ন কর্মী]

নববর্ষের শুভেচ্ছা

পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতিতে এক সর্বজনীন উৎসব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই এই দিনটিকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন প্রাণের উৎসবে। নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে বাঙালির গ্রামীণ জীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমরা কেউ ভুলতে পারি না। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত যা কিছু নতুন সবই আমরা বরণ করে নেই। অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুনের পথ চলা, নতুন করে শুরু করা, হতাশাকে ভুলে গিয়ে এক সুন্দর ভ্রাতৃত্বময় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখি। বাঙালি সমাজে পুরুষরা একসাথে একই রকমের রঙিন পাঞ্জাবি পরে এবং নারীরা নানা রঙের শাড়ি পরে বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করে। বৈশাখী মেলা মানেই এক অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলা। মেলায় বাঙালির প্রাণের বিভিন্ন গান বেজে ওঠে যেমনঃ লালনের গান, হাছন রাজার গান, জারি-সারি গান প্রভৃতি। মেলার বিভিন্ন স্টলে ধুম পড়ে বাঙালি খাবারের। বড় বড় শহরে নামে বিভিন্ন শোভাযাত্রার ঢল। হাতি, পাখা, মোরগ, পেঁচা, বাঘ প্রভৃতি বানিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বৈশাখ উদযাপনের এক অন্যরকম আমেজের সৃষ্টি করে। বাঙালির এই নিজস্ব সংস্কৃতিকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন আন্তরিকভাবেই লালন এবং পালন করে। এসকেএস ফাউণ্ডেশন যেমন বাঙালির এই প্রাণের উৎসবে শামিল হয়, তেমনি বিভিন্ন আয়োজনে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উৎসবকে সরব করে তোলে। আমাদের এই প্রাণের উৎসবে আমি আজ ১৪২৯ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। কবির ভাষায় শেষে বলবো-'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে'। শুভ নববর্ষ!

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউণ্ডেশন

মিহির সরকার, সহকারী শিক্ষক - চারু ও কারুকলা, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

গ্রামেও বৈশাখ আসুক

মাহফুজ ফারুক

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...।' রবীন্দ্রনাথের এই গানের সুরে সুর মিলিয়ে হৃদয় থেকে আমরা বৈশাখকে ডাকি। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে চৈত্রকে বিদায় জানিয়ে প্রতি বছরই বৈশাখ আসে। তবে, সারা বছর পান্তা খাওয়া হোক বা না হোক পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ না খেলে শহরের ঘরে বোধ হয় বৈশাখ আসে না। ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরকেন্দ্রিক মঙ্গল শোভাযাত্রা, বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতার সরাসরি সম্প্রচার আর দীর্ঘ প্রতিবেদনের ভেতর দিয়ে গণমাধ্যমে আমরা এখন বলতে গেলে প্রায় একতরফা শহুরে বৈশাখের চিত্র দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। গ্রামের বৈশাখ জাতীয় গণমাধ্যমে প্রায় উপেক্ষিত; অবহেলিতও। গ্রামে কি তবে বৈশাখ আসে না? না কি এর গুরুত্ব নেই?

অথচ বাংলা নববর্ষের জন্মের প্রয়োজনীয়তার সাথে গ্রামের মানুষের যাপিত জীবনের প্রয়োজনকে আলাদা করার কোনো দুঃসাহস কী আমরা দেখাতে পারি? পহেলা বৈশাখ, বছরে এই একটি দিন ছাড়া সারা বছর বাংলা তারিখ বা সন কোনোটাই কি আমরা আমাদের জীবনের/কর্মের অংশ হিসেবে নিয়েছি? একদিনের বাঙালি সেজে কেন তবে বাংলা নববর্ষ আর বাংলা সংস্কৃতির ধারক হিসেবে নিজেদেরকে জানান দিতে চাই?

বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে শহরের মতো গ্রামে শোভাযাত্রার আয়োজন নেই। পহেলা বৈশাখকে ঘিরে গানের আসর বসে না। বৈশাখী মেলাও আগের মতো খুব একটা চোখে পড়ে না। হালখাতাকে যেন আমরা দিনে দিনে যাদুঘরের দিকে ঠেলে দিয়েছি। যেসব গ্রামে এখনও এমন কিছু আয়োজন হচ্ছে সেটাও চাপা পড়ে যাচ্ছে জাতীয় আয়োজনের মিডিয়া কাভারেজের ভিড়ে। আমরা নিশ্চয়ই এ দায় এড়াতে পারি না।

প্রচলিত প্রায় সকল বর্ষপঞ্জির জন্মের সাথে কোনো না কোনো ধর্মের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষ সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। এর জন্মের প্রয়োজনীয়তার সাথে জড়িয়ে আছে কৃষি কাজ, খাজনা আদায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাষের। স্বভাবতই এটি হয়ে উঠেছে সর্বজনীন।

সর্বজনীন বৈশাখ আর বাংলা নববর্ষকে শুধুমাত্র নগর/শহর সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তুলে ধরার এক ধরনের মানসিকতার ভেতর দিয়ে আমরা গ্রাম থেকে বৈশাখ তথা বাংলা নববর্ষকে বরণের সংস্কৃতি-চর্চার শেকড় কেটে দিচ্ছি না তো? বৈশাখ শুধু কেন্দ্রের না প্রান্তেরও। সর্বজনীন বৈশাখকে, প্রান্তের বৈশাখকে তাই প্রান্তেও আসতে দিন। গ্রামেও বৈশাখ আসুক। জাতীয় গণমাধ্যমে আমরা গ্রামের বর্ষবরণ দেখতে চাই। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...।

[স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও সারাবেলা, গাইবান্ধা।]

নববর্ষে আত্মোপলব্ধি

এএইচএম শামছুজ্জামান আজাদ

পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালী জাতীর সংস্কৃতির অস্তিত্ব। মোঘল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ১৫৫৬ খৃঃ-এ বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। ধরে নেয়া হয় পরবর্তী বছরগুলো থেকেই পহেলা বৈশাখ উৎযাপনের প্রচলন শুরু হয়েছে। বিগত ৪৬৬ বছরের ইতিহাসে সংস্কৃতির অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। যেকোন পরিবর্তন বা বিবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাঙ্গালি জাতি সত্যিকার অর্থে তাঁর ঐতিহ্যের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের আত্মপরিচয় বা মর্যাদার বাহ্যিক রূপই হচ্ছে সংস্কৃতি। মোতাহার হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতির ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন। সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব জড়িয়ে থাকে। জীবনকে সহজ, সুন্দর করে রাখতে মন্দের বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, আচার - আচরণ, বিশ্বাস, নীতিবোধ, রীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব ও জাতীয় অর্জন।

পান্তা ইলিশ, মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা বা লোকসঙ্গীতের মতো কিছু প্রথা চলমান থাকলেও বাস্তবে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের আসল বাঙ্গালীপনার ঐতিহ্য। আর তাই আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা আজ অবস্থান করছেন বৃদ্ধাশ্রমে। আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া শিষ্ঠাচার, আমাদের ঐতিহ্যের আচার-আচরণ। আমাদের আতিথেয়তা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি আদর-স্নেহ। একান্নবর্তীর ভালোবাসা আজ বিবর্তিত। আসুন আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরি, মনে করিয়ে দেই আমাদের সেই ঐতিহ্য, সেই অহংকার যা বাঙ্গালি জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে সারা পৃথিবীর কাছে।

বারবার বৈশাখ আসে

মোঃ সাদমান সাদিক
৪র্থ শ্রেণি
এসকেএস স্কুল এণ্ড কলেজ

বারবার বৈশাখ আসে
প্রচন্ড তাপদাহে সূর্যটা হাসে।
বৈশাখে উচ্ছল ধরাতল,
রৌদ্র উঠে জ্বলজ্বল।
বারবার বৈশাখ আসে,
প্রচন্ড তাপদাহে সূর্যটা হাসে।
বৈশাখ একপেশে ঝড়ো বয়,
প্রাণ যেন যায় যায়।
বারবার বৈশাখ আসে,
প্রচন্ড তাপদাহে সূর্যটা হাসে।
পুকুরের ঘোলা জলে,
চাঁদ যেন ছলছলে।
বারবার বৈশাখ আসে,
প্রচন্ড তাপদাহে সূর্যটা হাসে।

বৈশাখের সুখ-দুঃখ

রিতুমনি
একাদশ শ্রেণি
এসকেএস স্কুল এণ্ড কলেজ

ফতুয়াটা আমার ভারি পুরোনো
প্যান্টেও কত তালি!
গায়ে জমেছে হাজার ধুলো
ক্ষার ফুরোলো কালই !!
নতুন রঙে, নতুন সাজে নতুন দিনের তরে,
কোমল-বিধান ওরা সবে পান্তা ইলিশ খাবে
পাঠশালাতে করছিল বলাবলি
শুনি আর হাসি মনে মনে
পান্তা আবার নতুন কী ছাঁই?
খাইতো প্রতি মধ্যাহ্নে!
বলছিল আরও! যাবে নাকি ওরা রমনার বটমূলে
মন্ডা, মিঠাই, সে আর পিঠে পুলির আয়োজনে
ভারি সুন্দর! ফতুয়াটা- আজ পরেছিল বন্ধু কোমল
বৈশাখী মেলায় যাবে বলেই, সেজেছিল অমন!
রং খেলেছে, মেলা ঘুরেছে, কিনেছে নতুন বাঁশি
রয়েছি কেবল আমিই পড়ে! দিনটাই মিছিমিছি
কি হল বাবা? বলছো না যে কিছু
পান্তায় আমার কাঁচা লঙ্কা! শুধু?
আর, ইলিশ ভর্তা, রসগোল্লা এসব তবে ওদের বুঝি?
এত সব! এত কিছু?
বল না বাবা,
আমার গায়ের ধূলো মুছে দেবে না নববর্ষ?
আমার খিদে মেটাবে না বৈশাখ?
তুমি আমায় দেবে না নতুন জামা?
নববর্ষের নব দিনে?
চুপ করে কেন বাবা?
বলো না আমায় কিছু-
'পহেলা বৈশাখ' শুধুই ওদের!
আমায় দেবে না কিছু?

পহেলা বৈশাখ

জান্নাতুল মাওয়া নিঝুম
৭ম শ্রেণি
এসকেএস স্কুল এণ্ড কলেজ

হাজার কাজের মধ্যে দিয়ে
কেটে গেলো গোটা বছর
নববর্ষের আহ্বান জানাতে
আর মাত্র একটি প্রহর।
গুনতে গুনতে সময় কাটে
লাল আভা দেখি পূবের কোণে
শঙ্খ ধ্বনিতে জাগলো পাড়া
নববর্ষের আবাহনে।
স্মৃতি বললো, ভুলো না আমায়
নতুন বছরের স্মৃতির টানে-
ইচ্ছে হলে ডেকে নিও
আছি তোমার মনের কোনে।
শুকনো পাতা ঝড়ে পড়েছে ফুটেছে গাছে নবমঞ্জুরি,
বোশেখ মাসের দাবদাহে
পড়েছে বাঙ্গালি ধুতি শাড়ি।
ব্যবসাদাররা হিসেবে ব্যস্ত
হালখাতা পাশে মস্ত ভারী।
কচিকাচারা খুশিতে মাতে
ভুলেছে সব দুঃখ আড়ি।
হরেক রকম জিনিস নিয়ে
গ্রামগঞ্জে বসেছে মেলা।
বাউল সুরে গাইছে দূরে
মানবতার সেই গান।
নতুন বছর আহ্বানে ছোট্ট মোর এই ইচ্ছা,
সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষের
আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পয়লা বৈশাখ

নাসমুস সাবিক (তুলন)
শ্রেণিঃ ১০ম
এসকেএস স্কুল এণ্ড কলেজ

আজি বছরান্তে এই মিনতি বিশ্ববিধাতার কাছে
যেন আসছে বছর শুভোয় কাটে হাসি আলোর মাঝে
তেমনি জীবন, তেমনি স্বপন
আলো আধারে লুয়োকিত ক্ষণ
তেমনি দিনের প্রকাশ আভরণ
জীবন যা ফেলে এসেছে দশটি বছর পিছে,
যেন নতুনত্বের ছোঁয়ায় সবি নতুন করে বাঁচে।
এবার সফলতার সব সম্ভাবনা
নিতান্তই যা ছিল অজানা,
যেন হাত বাড়ালেই দেয় তা ধরা
জীবনে যত আছে,
আজি বছরান্তে এই মিনতি বিশ্ববিধাতার কাছে।
যেন আর না ভাবায় অতীত স্মৃতি না পাওয়ার ইতিহাস
আগত শতাব্দী শোনায় কেবল পাওয়ার পূর্বাভাস।

মনমাঝি

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

ভাঙা নৌকো ডাঙায় রাখা
বৈঠা চালের বাতায়
তুই তো ছিলি মনের মানুষ
এখন স্মৃতির পাতায়।

বৈঠা যেমন নৌকাখানায়
ধরলো যমের ঘুণ
চণ্ডীচুলে মাধব পাটনি
দাঁতে কাটি চুন।

ভাবছি এবার এই বোশেখে
আলকাতরা দেবো।
নোঙর-ছেঁড়া উতলা দ্বীপ
তোকেই আনতে যাবো!

আবার এসেছে বৈশাখ

বুলু রানী ঘোষ

আবার এসেছে বৈশাখ দেখো আবার এসেছে ঐ,
কচি পাতার বুকে দোল, আকাশে বাতাসে হইচই।

নতুন সুরে নতুন পুলক জাগিছে হিয়ার মাঝে,
দুরন্ত পায়ে ছুটে চলে যৌবন নব বৈশাখী সাজে।

কিশোর বেলা ফিরে ফিরে আসে কালবোশেখীর ফাঁকে।
আমের মুকুলে মৌমাছি গায়, রাঙা সুর্যের ডাকে।

মাঠে জমে ওঠে বৈশাখী মেলা, পায়ে
ওঠে বিহুতাল,
নতুন জলের ছোঁয়ায় জাগে শুকনো দীঘি, নদী, খাল।

পুরাতনকে জানিয়ে বিদায় যত ক্লেদ ভুলে যাই ,
পূর্ণহোক সব শূন্যতা এমন বৈশাখ চাই।

তাহসিন রহমান মৌরি, ৫ম শ্রেণি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ